# নন্দপুরের অঘটন - অজেয় রায়
# Nandapurer Aghatan by Ajeo Ray

Golpa **নন্দপুরের অঘটন - অজেয় রায় Nandapurer Aghatan by Ajeo Ray**

by boidownload

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেসের এক অংশে বঙ্গবার্তার সম্পাদকের ছোট্ট অফিস ঘরে উকি দিল দীপক। সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তখন চেয়ারে গা এলিয়ে আধশোয়া হয়েছিলেন। মাঝবয়সি দৃঢ়কায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। কপালে চিন্তার ভাঁজ। দীপককে দেখে তিনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, “এসো দীপক, তোমার কথাই ভাবছিলুম।

দীপক উল্টো দিকে চেয়ারে বসল।

দীপক রায় বঙ্গবার্তা কাগজের একজন রিপোর্টার। বছর পচিশ বয়স। ভবানী প্রেসের মালিক কুবাবু বঙ্গবার্তা নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটি প্রকাশ করে লাভের মুখ মোটেই দেখেন না। তবু এই কাগজ চালাতে কুঞ্জবাবু এবং তার বিনি মাইনের সাংবাদিকদের উৎসাহে কমতি নেই।

কুঞ্জবিহারী বললেন, কাছারিপট্টির ভোলানাথ সরকারকে চেন? প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি কারন।

দীপক বলল, "দেখেছি। নাম শুনেছি। তবে আলাপ নেই। "হুম্। নন্দপুর গ্রাম কোথায় জানো?

'জানি। বোলপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে। ইলেমবাজার যাওয়ার পথে, বাস রাস্তার কাছে। বাঁ পাশে। একবার গেছলাম ওখানে।

সামনের টেবিলে টোকা মারতে মারতে কুবাবু বললেন, নন্দপুরের একটা ইন্টারেস্টিং খবর শুনলাম। গ্রামটায় ঘুরলে দেখতে পাবে কয়েকটা ছোট বড় পাকাবাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বাড়িগুলোর ভিতরে আর চার পাশে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। কেউ থাকে না। এর কারণ জানো?"

না। দীপক ঘাড় নাড়ে। 'একটা স্যাড হিস্ট্রি আছে। প্রায় ষাট বছর আগে নন্দপুরে একবার ভয়ঙ্কর মড়ক লাগে। স্মল পক্স। মারাত্মক গুটিবসন্ত। প্রায় উজাড় হয়ে যায় গী। বেশির ভাগ লোক মারা যায়। বাকিরা প্রাণভয়ে পালায়। বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। খাঁ খাঁ গ্রামে ঘরে ঘরে শুধু মৃত বা মরণাপন্ন মানুষ। শিয়াল কুকুরে বাড়ি বাড়ি ঢুকে ছিড়ে খেয়েছিল মৃত এবং মুমুর্মু অসহায় লোকগুলিকে। শকুনের দল নেমে এসেছিল গ্রামে। আতঙ্কে দু-তিন বছর কেউ আর ওই গ্রামে বাস করতে আসেনি। যারা ফিরল পরে তাদের অনেকেই আর তাদের পুরনো ভিটেতে থাকেনি। নতুন বসতবাড়ি বানায়। ভূত-প্রেতের ভয়ে আর কি! বাড়িগুলোয় কত প্রাণ বেঘোরে গিয়েছে। তাদের সংকার হয়নি ঠিকমতো। পরিত্যক্ত পাকা বাড়িগুলো এখনও প্রায় টিকে আছে, তবে মাটির বাড়িগুলো ধসে গিয়েছে।'

'ভোলা সরকারের দেশ ওই নন্দপুর। ওখানে ওর পূর্বপুরুষের বিশাল বাড়ি আছে। কিন্তু সে বাড়ি এখন পোড়ো। মড়কের পর ওদের বংশের কেউ আর নন্দপুরে বাস করেনি। এখন ভোলা সরকারের নাকি শখ হয়েছে পূর্বপুরুষের ওই

পোড়োবাড়ি সংস্কার করে ভবিষ্যতে সেখানে বাস করবেন। অন্য শরিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এ বিষয়ে। তবে আগে ক'দিন বাড়িটার ভিতর ঘুরে-ফিরে, রাতে থেকে বুঝে নিতে চান বাড়িটায় বাস করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা? অর্থাৎ ভূত-টুতের উপদ্রব আছে কিনা? যদি ভয়ের কিছু না থাকে তবেই পয়সা ঢালবেন বাড়ি সারাতে।শরিকদের অংশগুলোও কিনে নিতে পারেন। অবশ্য দরে পোষালে। বাড়ির অন্য শরিকদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই এই প্রস্তাবে। কারণ ওই পোড়ো বাড়ির ভাগের জন্য যা মেলে তাই লাভ। গতকাল থেকে ভোলা সরকার তীর এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছেন। তোমায় নজর রাখতে হবে ব্যাপার কী দাঁড়ায় ? ভালো স্টোরি হতে পারে বার্তায়। হেডিং দেওয়া যাবে—অতীতের টানে। কিংৰা-পূর্বপুরুষের ভিটের টানে।

প্রেসের কম্পোজিটর বৃদ্ধ দুলালবাবু এক যগকে পাশে এসে শুনছিলেন কথাবার্তা। তিনি রোগে মন্তব্য করলেন, “ভোলা সরকারের ভীমরতি হয়েছে। বুঝবে ঠেল।” * কুঞ্জবিহারী বললেন, 'ফলটা ভালো হলে ভালো। এরপর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে যোগ করলেন, আর অঘটন কিছু ঘটলে আরও ভালো। মানে আমার কাগজের স্বার্থে। জব্বর খনর হাবে। দীপক, নন্দপুরের কাউকে চেনো তুমি?

‘চিনি, জানাল দীপক। “উত্তম। চলে যাও নন্দপুর। পারলে দু এক রাত থেকে যেও ওখানে। ভূত-প্রেতের আবির্ভাব সাধারণত রাতেই হয়। বরাতে থাকলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখতে পারবে। উইশ ইউ গুন্ লাক।

পরদিন সকালে নন্দপুরে গিয়ে নিতাইকাকার কাছে সরকারদের পোড়ো বাড়ির খোঁজ নিল দীপক। বাড়িটা পুপাড়ায়, অল্প দূরে। গতকাল থেকে ভোলানাথ সরকার বাড়িটা সাক করতে লেগেছেন। ভোলাবাবুর এক বন্ধুও এসেছেন সঙ্গে। দীপক পুপাড়ায় চলল।

সরকার বাড়িটা দোতলা। মাঝারি আকারের অট্টালিকা বলা চলে। বোঝা যায় রীতিমতো ধনী ছিল এই পরিবার। একদা বাড়ি ঘিরে ইটের পাঁচিল আজ নিশ্চিহ্ন। কম্পাউন্ডের ভিতরে মস্ত মস্ত গাছ। পুরনো আমলের বাগানের আম কাঠাল ইত্যাদি ফলের গাছের সঙ্গে মিশে আছে অনেক বুনো গাছ। বড় গাছগুলোর তলায় এবং বাড়ির চারধারে ঘন আগাছ। তবে সামনে কিছু ঝোপঝাড় সদ্য কাটা। বাড়িতে ঢোকার প্রকাণ্ড সদর দরজার মুখে ঠাসা ভিড়। গ্রামের যত নিষ্কর্মা পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ভিতরে।

সদর দরজায় পাল্লার চিহ্ন নেই। কেবল কাঠের ফ্রেমের সামান্য অংশ তখনও আটকে আছে দেওয়ালে। দীপক ভিড় কাটিয়ে সামনে গেল। | চারকোনা বিরাট উঠোন। বাঁধানো। তিন দিকের উঠোন ঘিরে উঁচু বোয়াক। রোয়াকের ধার ঘেষে গোল মোটা থামের সারি খাড়া হয়ে আছে দোতলার বারান্দার ভার মাথায় নিয়ে। বোয়াকের লাগোয়া পরপর ঘর। ঘরগুলোর দরজা জানলার যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই আর অন্ত নেই। তাদের অধিকাংশের পাল্লা ফ্রেম উইয়ে খাওয়া জরাজীর্ণ অথবা বেমালুম লোপাট। উঠোন ও রোয়াকে মেঝে খুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে প্রচুর আগাছা। দেওয়াল আর মেঝের ফাটল থেকে ডালপালা মেলেছে অনেক বড় অর্থ।

দু'জন মজুর কাটারি দিয়ে উঠোনে ঝোপ কাটছে। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোলা সরকার। দোতলায় নজরে আসে লোহার রেলিং দেওয়া বারান্দা। মানুষের হঠাৎ উৎপাতে বিব্রত এই পোড়ো বাড়ির বাসিন্দা অজস্র পায়রা ও শালিক পাখি চেঁচামেচি ওড়াউড়ি করছে।

ভোলানাথ সরকারের চেহারা ছোটখাটো কৃশকায় গৌরবর্ণ। পরনে ধুতি ও ফুলহাত শার্ট। পায়ে চটি। বয়স বছর পঞ্চাশ। দীপক শুনেছে যে মানুষটি অতি নিরীহ। ওঁর পক্ষে এমন দুঃসাহসিক কাজে নামা যেন ঠিক মানায় না। দীপক গুটি গুটি গিয়ে ভোলানাথের পাশে হাজির হল। ভোলাবাবু সপ্রশ্নভাবে তাকাতে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয় পারবেন থাকতে?

"দেখি, ইচ্ছে তো আছে।' মৃদুস্বরে জানালেন ভোলাবাবু। . 'হঠাৎ এমন ইচ্ছে হল কেন?' প্রশ্ন করে দীপক।

একটু ইতস্তত করে ভোলানাথ বললেন, মানে দু-দিন স্বপ্নে দেখলাম এই বাড়ি। মনে হল পূর্বপুরুষরা বুঝি চাইছেন আমি তাদের পুরনো ভিটে উদ্ধার করি। বাস করি এই বাড়িতে।

'বোলপুরের বাসা তুলে দেবেন?

'না না, এখুনি নয়। আপাতত মাঝে মধ্যে আসব। পরে স্থায়ীভাবেও থাকতে পারি। অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে' ঢোক গিলে চুপ করে যান ভোলাবাবু।

মানে এ বাড়িতে বাস করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, তাই তো?" দীপকের জিজ্ঞাসা। 'হু, তাই।" আড়ষ্টভাবে মাথা ঝাকান ভোলাবাবু। কাল রাতে ছিলেন এ বাড়িতে?" না। আগে একটু সাফসুফ করি। দেখছেন তো কি হাল। আজ এখানে রাতে থাকার প্ল্যান আছে কি? 'দেখি, কিছু ঠিক করিনি।' ভোলানাথ আমতা আমতা করেন।

দীপক বোঝে, ভোলাবাবু এখানে রাত কাটাতে ভয় পাচ্ছেন। সে উৎসাহ দেয় ভোলাবাবুকে, বাড়িটা এখনও কিন্তু খুব মজবুত আছে। দেওয়াল কী পুরু! ছাদের অবস্থা কেমন দেখলেন ?"

ভাঙেনি, তবে ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়,' জানালেন ভোলাবাবু।

এই সময় একজন মাঝবয়সি পুরুষ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন একতলায়। লোকটি লম্বা, বলিষ্ঠ। রং কালো। মুখের ভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি ও মালকোচামারা ধুতি। পায়ে রবারের জুতো। হাতে একটা শাবল। তিনি এসেই মজুরদের কর্কশ স্বরে ধমকে উঠলেন—এই, হাত চালা চটপট। নিচের ঘরগুলো আজ সাফ করা চাই।'

মজুর দু'জন একটু বিশ্রাম নিতে বিড়ি ধরিয়েছিল। তাড়া খেয়ে কয়েক টান দিয়ে বিড়ি ছুড়ে ফেলে বাজার মুখে ফের কাজ শুরু করল। আগন্তুক দৃষ্টিতে দীপককে এক দেখে নিয়ে, উঠোনের কোণে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলেন। 'উনি কে?' জিঙ্গেস করে দীপক।

'তারাপদ,' জানালেন ভোলাবাবু, আমার বন্ধু। আত্মীয়ও বলা যায় শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। ওই আমায় সাহস নিয়ে এ কাজে নামিয়েছে। নইলে আমার ঠিক ভরসা হচ্ছিল না।

আধঘণ্টাটাক দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরকার বাড়ি পরিষ্কার করা দেখে দীপক নিতাইকার বাড়িতে ফিরল।

বিকেলে সন্ধ্যার খানিক আগে দীপক সরকার বাড়িতে এবার টু মারল। বাড়িটার সামনে গ্রামের লোকের ভিড় তখন আর নেই। বোধহয় অনেকক্ষণ সাফাই করা দেখে একঘেয়ে হয়ে চলে গিয়েছে তারা। সরকার বাড়ি তখন নিঝুম। বাইরে তখনও দিব্যি দিনের আলো। কিন্তু চারপাশে বড় বড় ঝাকড়া গাছ থাকায়

এ বাড়িটাকে ইতিমধ্যেই আঁধার ঘিরে ধরেছে। সদর দরজাপথে আবছা দেখা যাচ্ছে ভিতরের দালানের কিছু অংশ।

ভোলাবাবুরা আছেন না সটকেছেন? ভাবে দীপক। সহসা দোতলায় একটি জানলা দিয়ে দেখা গেল তারাপদবাবুর মুখ, কয়েক পলকের জন্য। খানিক বাদে খুটখাট শব্দ শোনা গেল বাড়ির ভিতর থেকে। তবে বোধহয় ভোলাবাবুরা এখানে থাকছেন আজ রাতে। দীপক ঠিক করল, সেও আজ রাতে থেকে যাবে নিতাইকাকার কাছে। যদি কিছু ঘটে সঙ্গে সঙ্গে জানা মারে।

রাত ন'টা নাগাদ খাবার পর দীপক ফের এল সরকার বাড়ির খোঁজ নিতে। গোটা বাড়ি তখন ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। কাছাকাছি অন্য বাড়ি নেই। গ্রামের লোকের কারও সাড়াশব্দ কানে আসছে না। সরকার বাড়িও নিস্তব্ধ। বাড়ির সদর থেকে হাত তিরিশ তফাতে পায়ে চলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজর করে দীপক। সঙ্গে টর্ক থাকলেও বাড়িটার বেশি কাছে ঘেষতে তার সাহস হল না। যে সরু পথটা সদর দরজা অবধি পৌঁছেচে তার দুধারে ঝোপঝাড়। গরমকাল। সাপখোপ বেরতে পারে। নানা কীটপতঙ্গের বিচিত্র ডাক শোনা যাচ্ছে। অজানা অদেখা কত জীবের গোপন চলাফেরার খসখস আওয়াজ। আবছা টাদের আলোয় বিশাল বাড়িটাকে সত্যি ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। দীপকের গা ছমছম করে। | একটু আলোর আভা না? ই, তাই। সদর দরজা দিয়ে চোখে পড়ল মিটমিটে একটা আলো। জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে যেন কেউ হেঁটে গেল একতলার রোয়াক দিয়ে। অদৃশ্য হয় আলোটুকু। ফের নিছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যায় অট্টালিকা।

আরও খানিকক্ষণ নজরদারির ইচ্ছে ছিল দীপকের। কিন্তু বাধ সাধলো গ্রামের কটা খেকি তকর। দীপককে নির্জনে ভূতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুকুরগুলো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসে। কীরে বাবা, কামড়াবে নাকি? গাঁয়ের লোক চোর ভেবে তাড়া না করে? বেগতিক বুঝে দীপক সরে পড়ল। কাল ভোরে এসে জানতে হবে ভোলাবাবুদের অভিজ্ঞতা। নিতাইকাকাকে বলে রাখবে, সরকার বাড়ির কোনো খবর থাকলে যেন তাকে তৎক্ষণাৎ জানানো হয়।

খুব ভোরে দীপককে ডেকে তুলল নিতাইকাকা। -"ওহে শোনো, ভোলাবাবুর সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন।'

দীপক ধড়মড় করে উঠে বলল, 'কী করে?' | 'তা জানি না। সরকার বাড়ির কাছে পথের ওপর পড়ে আছেন। আমাদের পাড়ার জগবন্ধু প্রথম দেখে। সেই এসে খবর দিয়েছে।”

নিতাইকাকার সঙ্গে দীপক ছুটল সরকার বাড়ির উদ্দেশে।

পথের ধারে মাটিতে পড়ে রয়েছেন তারাপদ। চিৎ অবস্থায় কুঁকড়ানো আড়ষ্ট দেহ। বিকৃত মুখে যন্ত্রণার ছাপ। তখনও খবরটা বিশেষ চাউর হয়নি। মাত্র আট দশজন গ্রামের লোক মৃতদেহের পাশে থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

দীপক প্রাণহীন তারাপদবাবুকে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে সরকার বাড়ির ভিতর ঢুকল।

তারাপদবাবুর সাইকেলটা দেখা গেল একতলায় বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। ভোলানাথবাবু'-চেঁচিয়ে উঠল দীপক।

কোনো সাড়া নেই।

দীপক উঠে গেল দোতলায়। পর পর ঘরগুলোয় উকি দিয়ে চলে। একটা ঘরের মেঝেতে একখানি শতরঞ্চি পাতা। কিন্তু ভোলাবাবুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

দীপক নোংরা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদে উঠল। ফাকা ছাদ। দীপক নেমে এল একতলায়। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে থমকে গেল। এরপর কয়েকটা ঘরে উকি দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল সরকার বাড়ি ছেড়ে।

তারাপদবাবুর মৃতদেহ ঘিরে তখন রীতিমতো ভিড়। চারদিক থেকে লোক আসছে হন্তদন্ত হয়ে। দীপক সেখানে দাঁড়ায় একটুক্ষণ। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে।

কী ভাবে মরল লোকটা?'

“কে 'জানে? আঘাতের চিহ্ন কিছু দেখছি না তো। ‘হাসপাতালে নিয়ে যাবে?

কী লাভ? একদম মরে কাঠ। বরং পুলিশে খবর দিই।'

দীপক আর অপেক্ষা করে না। নিতাইকাকার বাড়ি এসে নিজের বাইসাইকেলখানা বের করে জোর প্যাডেল মারল।

বোলপুর শহরে কাছারিপট্টির বাসিন্দাদের তখনও ভালো ভাবে ঘুম ভাঙেনি। ভোলাবাবুর বাসার দরজায় টোকা দিল দীপক। কপাট খুলে এক মাঝবাসি বিবাহিতা ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন-“কী চাই?”

“ভোলানাথবাবু আছেন?' বলল দীপক।

‘একবার ডেকে দিন, দরকার আছে।'

মহিলা ভিতরে গেলেন। ঘুম-জড়ানো চোখে বেরিয়ে দীপককে দেখে ভোলাবাবু অবাক—‘আপনি?”

দীপক চাপা সুরে বলল, 'জরুরি কথা আছে, আসুন বাইরে, ওই গাছটার নিচে।'

হতভম্ব ভোলাবাবু দীপককে অনুসরণ করেন। নিরালা গাছতলায় থেমে দীপক বলল, 'সেদিন আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমি দীপক রায়। বঙ্গবার্তা কাগজের রিপোর্টার। নন্দপুরে আপনার সন্ধানেই গিয়েছিলাম। আপনাদের পরিত্যক্ত বাড়ি উদ্ধারের বিষয়ে রিপোর্ট করতে। আচ্ছা কাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

‘কেন?

এখানে নিজের বাড়িতে,' জবাব দেন ভোলাবাবু।

“আর তারাপদবাবু?'

‘তারাপদ ওর গায়ে চলে গিছল।'

“ঠিক জানেন?

“হ্যা। দু'জনে একসঙ্গে বোরেই। বাস স্টপেজের কাছে একটা চায়ের দোকানে ও চা খেতে বসল। আমার তাড়া ছিল, তাই আমায় বলল চলে যেতে। আমি বাসে চলে এলাম। ও সাইকেলে যায়।

উনি কোথায় থাকেন? বেশি দূরে নয়। নন্দপুর থেকে মাইল দুই দক্ষিণে। বোলপুরে ফিরে আপনি সোজা বাড়ি এসেছিলেন, না নেমেছিলেন কোথাও ?

‘না, সোজা বাড়ি আসিনি। বাজার করেছি কিছু। কী ব্যাপার বলুন তো?”

দীপক গম্ভীরস্বরে কাটা কাটা ভাবে বলল, 'আজ ভোরে তারাপদবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে নন্দপুরে সরকার বাড়ির কাছে।

‘আঁ, সেকি! আঁতকে উঠলেন ভোলাবাবু।

‘হু। খুব সম্ভব তিনি আপনাকে বিদায় দিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিলেন সরকার বাড়িতে এবং রাতে কোনো রহস্যময় কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ভোলানাথবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, “হ্যা হ্যা, তাই হবে, তাই হবে। উঃ, কী ভীষণ কাণ্ড। এই ভয়েই আমি রাজি হইনি ওখানে রাতে থাকতে।'

দীপক বলল, 'পুলিশে হয়তো একটু বাদেই আপনার খোজে আসবে।' ‘আঁ, পুলিশ। পুলিশ কেন?” চমকে যান ভোলাবাবু।

কারণ আপনারা দু'জনে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে একজনের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। খুনও হতে পারে। সুতরাং অপরজন অর্থাৎ আপনার ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

‘কিন্তু আমি তো রাতে ছিলাম না ওখানে।

‘সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ।

ভোলাবাবু গাছের গায়ে হাত ঠেকিয়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলালেন। নইলে হয়তো টলেই পড়তেন মাটিতে। আর্ত চাপা কণ্ঠে বলতে থাকেন, “ওঃ, কেন যে ওর কথায় নেচে এ কন্মে নামলাম। গোয়ার্তুমি করে নিজের প্রাণটা খোল। এখন আমার সর্বনাশ হবে। ওঃ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্লিজ বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ।'

দীপক তীক্ষ্ণ চোখে ভোলাবাবুর মুখপানে চেয়ে বলল, “ওই বাড়িতে, 'আপনারা কি খুজছিলেন? গুপ্ত ধন?'

‘মানে মানে'—ভোলাবাৰু তোতলাতে থাকেন।

সত্যি কথা বলন,' ধমকে ওঠে দীপক, 'আমার কাছে কিছু চেপে গেলে মুশকিলে পড়বেন। মনে রাখবেন এই ঘটনার আমি একজন প্রধান সাক্ষী।

‘তাই। ঠিক ধরেছেন। মানে ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানেন'—থেমে থেমে ঢোক গিলতে গিলতে ভোলাবাবু যা বলে গেলেন তার সারমর্ম এই --

‘মাসখানেক আগে ভোলাবাবু পুরী বেড়াতে যান। সেখানে এক বৃদ্ধ ওড়িয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভোলাবাবু বোলপুর থেকে এসেছেন শুনে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে যে বোলর শহরের কাছে নন্দপুর গ্রাম তিনি জানেন কিনা? ভোলাবাবু বলেন, নন্দপুর তার পূর্বপুরুষের গ্রাম। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে, নন্দপুরে সরকার বাড়ি কি চেনেন?

ভোলাবাবু বলেন যে তিনি সরকার পরিবারেরই বংশধর।

বৃদ্ধ তখন জানায় যে সে পেশায় রাজমিস্ত্রি। ছেলেবেলায় ওড়িশা থেকে নন্দপুরে সরকার বাড়িতে তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল কিছু কাজ করতে। মনে আছে, বাবা একটা ঘর বানিয়েছিল একতলায়। ঘরের মেঝের নিচে ইট গেথে হোট সিন্দুকের আারের একটা চোরকুঠুরি বানায়। কেরের ওপরটা মিলিয়ে দেয় বাকি মেকের সঙ্গে। তবে ভবিষ্যতে খুজে পাওয়ার জন্য ওই চোরা গর্তের ঠিক মাথায় মেঝেতে একটি খুব ছোট পর এঁকে দেওয়া হয়। ওই চিহ্নের নিচে ইট সরালে আছে একটা চৌকো পাথর। পাথরখানা তুললে দেখা যাবে গুপ্ত ফোকর। বোধহয় কিছু দামি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয় ওই ফোকরে। আগে 'ডাকাতের ভয়ে এমনি ভাবে লুকিয়ে রাখা হত ধনদৌলত। কাজটা সেরে তারা ফিরে আসে ওড়িশায়। বাংলাদেশে তারপর সে বার দু'তিন গিয়েছে তবে নন্দপুরে আর যাওয়া। হয়নি। নন্দপুরে সরকার বাড়িতে এখন কেউ থাকে না শুনে বৃদ্ধ খুৰ আপশোস করে।

বৃদ্ধের কথাগুলি মাথায় নিয়ে বোলপুরে ফিরে আসেন ভোলাবাবু। সেই ভয়াবহ মহামারী হয়েছিল তাঁর ঠাকুরদার আমলে। ঠাকুরদারা দুই ভাই মারা যান। তাদের আট ছেলের মধ্যে দু'জন মাত্র জীবিত থাকেন। ভোলাবাবুর বাবা এবং বাবার এক খুড়তুতো ভাই। ভোলাবাবু ভাবেন, সরকার বংশে যে ক'জন রক্ষা পেয়েছিলেন তারা কি জানতেন ওই শুপ্ত ফোকরের খোঁজ? কখনও শুনিনি এ বিষয়ে। খুজে

দেখলে হয় যদি কিছু সোনাদানা মেলে? কিন্তু ওই ভূতুড়ে বাড়িতে একা একা খুজতে তার সাহসে কুলোয়নি। খবরটা নিজের বাড়িতেও বলেননি, পাছে রটে যায়। শেষে বলে ফেললেন তারাপদকে তারাপদ বেপরোয়া স্বভাবের। শুনেই লাফিয়ে উঠল। ঠিক করল খুঁজতে হবে গোপনে। এরপর সরকার বাড়ি সংস্কার করে বাস করার ছুতো করে তারা গুপ্তধন খুজতে লাগে। শর্ত ছিল যদি কিছু মেলে দু'জনের আধাআধি বখরা। মুশকিল হচ্ছিল, একতলায় প্রচুর ঘর। এবং প্রত্যেক ঘরের মেঝেতে ধুলো আবর্জনা বা খসে পড়া পলেস্তরা পুরু হয়ে জমেছে। মেঝে ফেটে চটা উঠে গিয়েছে অনেক জায়গায়। | ভোলাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চুলোয় যাক গুপ্তধন, এখন খুনের দায় থেকে রেহাই পেলে বাচি।

দীপক ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, 'তারাপদবাবু বোধহয় আপনাকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে ছিলেন। তাই আপনার অজান্তে গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলেন। আপনার কিন্তু এখন একবার নন্দপুরে যাওয়া উচিত। তবে এই গুপ্তধনের গল্প আর কাউকে না বলাই ভালো। তাহলে ফ্যাসাদ বাড়বে। আপনাদের আগের গল্পটাই আপাতত চালিয়ে যান।

দীপক ও ভোলাবাবু নন্দপুরে তারাপদবাবুর মৃতদেহের পাশে হাজির হয়ে দেখল যে পুলিশ এসে পড়েছে। বোলপুর থানার দারোগা একমনে শব পরীক্ষা করাছেন। এক বাদে দারোগা উঠে দাড়িয়ে ভোলানাথবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম ভোলানাথ সরকার।

‘আজ্ঞে হ্যা।

ইনি কে?' মৃত তারাপদকে দেখান দারোগা। তারাপদ ঘোষ।

আমার বন্ধু।'

‘আপনি রাতে ছিলেন সরকার বাড়িতে?’’ দারোগার প্রশ্ন।

‘‘আরে না। আমি বিকেলে বোলপুরে বাসায় ফিরে গিয়েছিলুম। তারপরও নিজের গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ ও কেন যে ফিরে এল বুকছি না? হায়, হায়। আমি বারণ করেছিলুম ওকে এখানে রাত কাটাতে।' কাতর কণ্ঠে বলেন ভোলাবাবু।

‘‘আপনারা সরকার বাড়িতে কী করছিলেন?’’

বোঝা গেল দারোগা ইতিমধ্যে ভোলাবাবুদের নন্দপুরে যাতায়াতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছেন। তবু একবার ঝালিয়ে নিতে চান খবরটা।

ভোলাবাবু দীপকের শেখানো মতো জবাব দিলেন।

'হুম। চলুন বাড়িটা একবার দেখা যাক। দারোগা গটগট করে এগোলেন। ভোলাবাবু সম্বন্ধে তার মনের ভাব ঠিক ধরা গেল না। দারোগার পিছনে শুকনো মুখে চললেন ভোলানাথ। তার পিছনে এক কনস্টেবল। তারপর দীপক। এবং দীপকের পেছনে বিরাট গ্রাম্য জনতা।

সরকার বাড়িতে ঢোকার মুখে দারোগা ফিরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'নো নো, এতজন ঢুকবেন না। কেবল তিন-চারজন সঙ্গে আসুন সাক্ষী হিসাবে। তিনি গ্রামের কয়েকজন

একতলায় ঘুরতে ঘুরতে এক কোনায় গিয়ে থমকে দাড়ায় দলটা। দেখা গেল, হাত চারেক লম্বা, ইয়া মোটা, কালো রঙের প্রকাণ্ড এক মৃত সাপ টান হয়ে পড়ে আছে বারান্দায়। সভয়ে মন্তব্য করল এক গ্রামবাসী, 'বাপরে, এ যে গোখরো। সাক্ষাৎ যম।'

সাপটার মাথা এবং দেহের কয়েক জায়গা থেতলানো। শাহেই পড়ে আছে একটা শাবল। কিছুদূরে উঠোনে পড়ে আছে কাচভাঙা একটা টর্চ। সাপটার সামনের ঘরে খোলা দরজার মুখে মেঝেতে রাখা একটা ভুসো মাখা লণ্ঠন।

দারোগাবার হাতের ব্যাটনটা নাচাতে নাচাতে মন্তব্য করলেন-"হম। এ কেস অফ মেক-বাইট। আমি তাই আন্দাজ করেছিলুম। এ সব বাড়ি তো সাপের আসা।

ভোলাবাবু ফ্যাকাশে মুখে কাঠ হয়ে দেখেন। বাইরে চমকানোর ভান করলেও দীপক মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কারণ দৃশ্যটা সে আগেই দেখে গিয়েছে।

এই দুর্ঘটনার পাঁচ দিন বাদে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দীপক সকালবেলা হাজির হল নন্দপুরে। দীপক নিতাইকাকাকে জানাল, 'ভোলাবাবুর সঙ্গে একবার সরকার বাড়িতে যাব। উনি কয়েকটা জিনিস ফেলে গিয়েছেন ওখানে। একা ঢুকতে ভরসা পাচ্ছেন না তাই আমাকে সঙ্গে আনলেন। তাছাড়া ওই বাড়ির কয়েকখানা ঘরের মেঝে মার্বেল পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। সেগুলো তুলে নেওয়া যায় কিনা দান করবেন। ওখানে বাস করা বোধহয় আর সম্ভব হচ্ছে না।"

‘সাবধানে ঘুরো বাবা, অভিশপ্ত বাড়ি, নিতাইকাকা সতর্ক করেন, আর সন্ধের পর থেকে না ওখানে।”

গ্রামের লোকের চোখ এড়িয়ে দু'জনে ঢুকে পড়ল সরকার বাড়িতে। তারপর সোজা গিয়ে ঢোকে একতলার একটা ঘরে, যে ঘরের সামনে মৃত সাপটা পড়ে ছিল। ঘরের এক কোণে সদ্য খানিক খোঁড়া হয়েছে। কিছু ভাঙা ইটের টুকরো পাশে জড়ো করা।

দীপক ব্যাগ থেকে ছেনি হাতুড়ি বের করে চটপট গর্তটা বড় করতে শুরু করল। মেঝের কয়েকখানা ইট ভেঙে তুলে দেখল নিচে একখণ্ড চ্যাপ্টা আয়তাকার পাথর। সে তুলল পাথরখানা। তার তলায় ইট গেঁথে তৈরি এক ছোট চৌকো কুঠুরি।

ফোকরের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে হাত বাড়িয়ে দীপক তুলে আনল ফুটখানেক লম্বা, বিঘত খানেক উচু ও ততখানি চওড়া চমৎকার নকশাকাটা একটা কাঠের বাক্স। টান দিতেই খুলে গেল বাক্সর ডালা। দেখা গেল ভিতরে রয়েছে চারটে পুরু হলুদরঙা পাত। একটা পাত হাতে নিয়ে দীপক জানাল, এ নির্ঘাৎ সোনা। সোনার বাট। বোধহয় কয়েক লাখ টাকা দাম হবে সব ক'টা মিলিয়ে। যাক ভোলানাথবাবু, আপনার ভাগ্যে তাহলে গুপ্তধন জুটল।”

ভোলাবাবুর মুখে অনেকক্ষণ কথা সরল না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ। চোখ বিস্ফারিত। অতঃপর কাপা কাপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'আঁ, সত্যি!'

দীপক হেসে ফেলল, “সত্যি বইকি। স্বপ্ন নয়। নিজেই দেখুন পরখ করে।' - ভোলাবাবু দীপকের হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনার কিন্তু আধাআধি ভাগ।' না। আমি কিছু চাই না। দীপক ঘাড় নাড়ে।।

না না, তা বললে হবে না, নিতেই হবে। এ সৌভাগ্য যে আপনারই দান। আমার কি সাধ্যি ছিল? ভোলাবাবুর কণ্ঠে আন্তরিক অনুনয়।

“উহু।” দীপক দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে বলল, একটা কারণে বড়ই আপশোস হচ্ছে। কেন জানেন? এমন ইন্টারেস্টিং কাহিনির আসল ঘটনাটাই কাগজে লিখতে পারব না। অভিশপ্ত সরকার বাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা এবং তারাপদবাবুর অপঘাত মৃত্যু নিয়েই স্টোরিটা তৈরি করতে হবে।

‘কেন? ভোলাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

‘মশাই, আপনারই জন্যে”, বলল দীপক, কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হলে সরকার বাড়ির যেখানে যত শরিক আছে সব্বাই গুপ্তধনের ভাগ দাবী করে বসবে। থখন আপনার ভাগে আর মিলবে কতটুকু? তাছাড়া মামলা-মকদ্দমা মহা ঝঞ্জাট লেগে যাবে। সুতরাং এই গুপ্তধন প্রাপ্তির খবর আপনি ঘুণাক্ষরেও যেন ফাস করবেন না।

তা বটে। চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়েন ভোলাবাবু।

দীপক বলল, আমার শুধু একটি অনুরোধ। হতভাগ্য তারাপদবাবুর পরিবারকে আপনার বিবেচনা মতো সাহায্য করবেন। এই গুপ্তধনের হদিশ তো উনিই প্রথম পেয়েছেন। তাতে আমাদের কাজ ঢের সহজ হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই পথচিহ্ন খুঁজে পেয়ে উনি গোপনে এসে খুঁড়ছিলেন এই জায়গায়। তারপর কিভাবে যে সাপের ছোবল খেলেন তা অবশ্য আর জানার উপায় নেই।